Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.70-75
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রাচীন ভারতের হস্তীদন্তশিল্প
(খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যবর্তী পর্যায়ের একটি রূপরেখা)

নূপুর দত্ত
সহ অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, শিশুরাম দাস কলেজ, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

ABSTRACT

With the beginning of agriculture and settled life, the human society required new types of tools and implements. This need gave impetus to the emergence of various occupations and these new professions led to the rise of new groups of artisans. These new artisans contributed to the socio- economic growth and development of the country.

A good number of crafts are supposed to have existed during the periods under survey. Ivory craft was one of them. This craft represented traditional characteristics in its line, form, style and execution. Thus ivory craft may be classified as industrial craft because the ultimate user of all kinds of products was the large section of the society. So mass production of these artifacts required organised labour, professionalism, creative instinct and proficiency.

This study tries to focus the growth and development of the traditional ivory craft of India. Various ancient Indian texts are the main sources of information about this craft. These texts highlight the dedication, proficiency of the artisans. We also come across the socio- economic value of this beautiful ancient Indian craft.

Key words : ivory craft, dantakara, elephants, tusk, ivory carvers.

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়নের সাথে সাথে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। এর সাথে নতুন নতুন জীবিকাধারী গোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে হস্তীদন্তশিল্পীরা ছিলেন অন্যতম। রাজতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে বিলাসবহুল দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বাড়তে থাকে। এই সময়কার শিল্পের মধ্যে হস্তীদন্তশিল্প ছিল উল্লেখযোগ্য। যে সব বস্তু দিয়ে বিলাসবহুল দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করা হোত, তার মধ্যে হস্তীদন্ত ছিল অন্যতম। শুধু বিলাস সামগ্রী নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী প্রস্তুতকল্পে হস্তীদন্ত ব্যবহৃত হতো। আলোচ্য সময়কালের মধ্যে হস্তীদন্তশিল্প স্বমহিমায় একটি বিশেষ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

সংস্কৃতে 'ইভদন্ত' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল হস্তীদন্ত। শিলভঙ্গ জাতকে (১.৭২) হস্তীদন্তকে 'দন্ত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে সব শিল্পী হস্তীদন্তের কাজ করতেন তাদের 'দন্তকার' বলা হত। ব্যকরণবিদ্ পাণিণিও হস্তীদন্তকে 'দন্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষে সুপ্রাচীনকাল থেকে যাতায়াতের জন্য ও যুদ্ধের জন্যে হস্তীদের ব্যবহার করা হত। হস্তীদন্তের ব্যবহারের ফলে হস্তীর কদর আরও বেড়ে যায়। হস্তীদন্তের সৌন্দর্য সম্পর্কে জৈন সাহিত্য 'উভাসাগাদাসাও'-তে একটি বর্ণনা পাওয়া

যায়। এখানে একটি স্বর্গীয় হস্তীর কথা বলা হয়েছে, যার দন্তটি ফুলের মত ধবধবে সাদা ও সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত। এই প্রকার বর্ণনা থেকে প্রাচীন ভারতে হস্তীদন্তের সমাদর সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

হস্তীদন্তের সমাদর প্রসঙ্গে বৌধায়ন ধর্মসূত্রে (১ ; ৮.৪৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুধ দিয়ে ধুয়ে হস্তীদন্তকে শুদ্ধ করা হোত। মনুস্মৃতিতে (৫.১২১) উল্লেখ করা হয়েছে যে গোমূত্র অথবা বিশুদ্ধ জলের দ্বারা হস্তীদন্তজাত সামগ্রী পরিশুদ্ধ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে হস্তীদন্তশিল্প সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। শিলভঙ্গ জাতকে (১.৭২) বলা হয়েছে যে একবার এক পথিক বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তখন হস্তীরূপী বোধিসত্ব তাকে পথপ্রদর্শণ করেছিল। বন থেকে বেরোবার পর ঐ পথিক যখন একদিন বারানসীর দন্তকার বীথিতে (হস্তীদন্ত শিল্প সামগ্রীর বাজার) এসে পড়ল, তখন হস্তীদন্তের দাম ও কদর সম্পর্কে পরিচিত হল। দন্তকারদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল যে মৃত হস্তীদন্তের তুলনায় জীবিত হস্তীদন্তের মূল্য অনেক বেশি। সে কথা শুনে লোভের বশবর্তী হয়ে পথিক আবার বনে ফিরে গেল এবং বোধিসত্বের কাছে তার দন্ত থেকে কিছুটা কেটে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। এই গল্প থেকেই সমকালীন সমাজে হস্তীদন্তের মূল্য এবং বাজারদর, চাহিদা সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়।

জাতকের কাহিনী থেকে হস্তীদন্ত শিল্পের কিছু প্রযুক্তিগত কৌশল সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। জীবিত হস্তীদন্ত মৃত হস্তীদন্ত অপেক্ষা অনেক নরম। যার ফলে খুব সহজেই ওই দন্তের ওপর কারুকার্য করা যায়। জীবিত হস্তীদন্তে একটি তৈলাক্ত ভাব থাকে যা মৃত হস্তীদন্তে থাকে না। তাই জীবিত হস্তীদন্ত সহজেই কেটে শিল্প কর্ম করা সম্ভব। স্বভাবতই এর দাম মৃত হস্তীদন্তের তুলনায় অনেক বেশি । ছদন্ত জাতকে (৫.৫১৪) একথা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। ছদন্ত জাতকে একটি ছয় দন্ত বিশিষ্ট হস্তীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই জাতকের গল্পের বহু দৃশ্য সাঁচিস্তুপের দক্ষিণ তোরণের গায়ে দেখতে পাওয়া যায়।

আলোচ্য সময়কালে হস্তীদন্ত শিল্প যে বিকশিত হয়েছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বারানসী, শাকল, কলিঙ্গ, মালব প্রভৃতি অঞ্চলে দন্তকারকদের বাজার বা দন্তকারবীথি ছিল। এখানে দন্তকাররা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রী করত। যে সমস্ত শিকারীরা অর্থের বিনিময়ে হস্তীদন্ত বন থেকে সংগ্রহ করে আনত তাদের বলা হত 'দন্তপজীবিনাহ' । এরা দন্তশিল্পে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জাতকে এই ধরণের দন্তোপজীবিনাহের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বারানসীতে এইরকমই একজন শিকারীর গল্প পাওয়া যায়, যিনি হস্তীবধ করে তার দন্ত সংগ্রহ করে দন্তকারবীথিতে গিয়ে বিক্রী করতেন। হস্তীদন্ত শিল্পের গুণগত উৎকর্ষতা নিয়ে একটি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন সুদক্ষ হস্তীদন্তকার (দন্তকলাচার্য) একবার আলেকজন্দ্রিয়ায় যবন দেশ পরিভ্রমনে যান। যেখানে গিয়ে তিনি একজন সুদক্ষ যবন শিল্পীর সাথে সাক্ষাত করতে যান। সেই শিল্পী তখন গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন। দন্তকলাচার্য তার সাথে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরী কিছু চাল (দন্ততন্ডুল) এনেছিলেন। সেগুলো তিনি যবন শিল্পীর স্ত্রীর হাতে দিয়ে রান্না করতে বলে চলে যান। যবন শিল্পীর স্ত্রী তখন ঐ চালকে রান্না করার বহু প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই গল্পটি থেকে ভারতীয় দন্তকারদের শিল্পের উৎকর্ষতা সম্পর্কে একটা ধারনা করা যায়। তাদের হস্তশিল্প এতটাই উৎকৃষ্ট মানের ছিল যে, একজন সুদক্ষ যবন শিল্পীর স্ত্রীও তা অনুধাবন করতে পারেননি। তাই হস্তীদন্ত দিয়ে তৈরী চাল দিয়ে ভাত রান্না করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিলাসবহুল দ্রব্য ছাড়াও হস্তীদন্তের দ্বারা দৈনিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদিও তৈরী হোত। বিনয়পিটকে (৩.৭) বলা হয়েছে যে দন্তকাররা হস্তীদন্তের ছোটো ছোটো বাক্স তৈরী করতেন, যার মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু- ভিক্ষুণীদের সূঁচ-সুতো , কান পরিষ্কার করার কাঠি, মলম প্রভৃতি রাখার প্রচলন ছিল। বিনয়পিটকে (১১.৬-১২) আরও বলা হয়েছে যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ঘরের দেওয়ালে যে কীলক পোঁতা থাকত, সেগুলি হস্তীদন্ত দ্বারা নির্মিত হতো । এই কীলকগুলি তারা তাদের ভিক্ষাপাত্র, বস্ত্র বয়ন করার কাঠামো, ঝোলা প্রভৃতি ঝুলিয়ে রাখার জন্য

ব্যবহার করতেন (৩.১-৩)। এই বস্তুগুলি যদি কেদারা বা পালঙ্কের পায়ের কাছে রাখা হোত তবে ইঁদুর বা সাদা পিঁপড়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই হস্তীদন্তের কীলক তাদের জীবনধারনের সামগ্রীগুলি রক্ষা করতে সাহায্য করত। এছাড়াও ভিক্ষুদের ব্যবহার করার ছুরিকার হাতল (৫.১১.২) এবং সেলাইয়ের জন্যে ব্যবহৃত আঙ্গুলের দস্তানা (৫.১১৫) প্রভৃতি হস্তীদন্তের দ্বারা নির্মিত হোত। খ্রিষ্ট্রীয় শতকের প্রথমদিকের রচনা হল মহাবস্তু। এটি সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে যারা হস্তীদন্তের কাজ করতেন, তারা একই সাথে শঙ্খ দ্বারা শিল্পজাত দ্রব্যও তৈরী করতেন। এই সকল কারিগরদের 'গজদন্ত শঙ্খমণি' বলা হোত। কুশা জাতকে (মহাবস্তু ৪৭৪) বলা হয়েছে যে রাজার আদেশে রাজ পরিবারের মহিলাদের জন্যে হস্তীদন্ত ও শঙ্খ দিয়ে অলঙ্কার ও অন্যান্য সামগ্রী প্রস্তুত করা হোত। এর মধ্যে বালা, কাজলদানি বা অঞ্জনীয়, গহনার বাক্স , মলমদানি, ঝালরযুক্ত পাড় (যা মহিলাদের বস্ত্রের সাথে লাগানো হোত) এবং নানাবিধ পদ অলঙ্করণের দ্রব্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই গল্পে রাজা কুশাকে এই ধরনের একজনে কারিগররূপে দেখানো হয়েছে। তার হাতের তৈরী হস্তীদন্ত ও শঙ্খজাত দ্রব্যাদি এতই চমৎকার ছিল যে তার সূক্ষতা লক্ষ্য করে দক্ষ কারিগরেরাও বিস্মিত হয়ে যেতেন। তারা তাকে 'শিল্পীশ্রেষ্ঠ' বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। প্রতিটি শিল্পজাত দ্রব্যের গায়ে কুশা নিজের নামটি খোদাই করে দিতে ভুলতেন না।

এই সমস্ত বৌদ্ধ সাহিত্যের বিবরণী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতকের থেকে শুরু করে তার পরবর্তী কয়েক দশক যে হস্তীদন্ত শিল্প তার নিজস্ব একটি স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, একথা সহজেই বোঝা যায়। মৌর্য যুগে এই শিল্প আরও রাজকীয় মর্যাদালাভ করে। অর্থশাস্ত্রে (২.২.৫০) বলা হয়েছে মৌর্য যুগে হস্তীবনের অস্তিত্ব ছিল। এই বনে শুধু হস্তীরা বাস করতে। অর্থশাস্ত্রে রাজাকে হস্তীবন রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে রাজা যদি প্রয়োজন বোধ করেন তবে হস্তীদের রক্ষার্থে তিনি নতুন হস্তীবন সৃষ্টি করতে পারেন। রাজ্যের সীমানায় বন্য এলাকা থেকে হস্তীবনকে পৃথক করে রাখা হোত। যে সমস্ত লোকেরা এই বনে কর্মরত ছিলেন, তারা এই বনে প্রবেশ ও নির্গত হবার পথ চিনতেন। দুর্গম পর্বত, নদী, জলাশয় প্রভৃতি অতিক্রম করে তারা হস্তীবন ঢোকার ও বের হবার পথ রপ্ত করেছিলেন। হস্তীবনকে দেখাশুনা করার জন্যে অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিলেন। তার অধীনে বহু কর্মচারী হস্তীবন ও হস্তীদলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে থাকতেন। যদি কেউ হস্তীবধ করত তার সাজা হত মৃত্যুদন্ত। যদি কোনো হস্তীর স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে তার দন্তজোড়া কেউ কেটে নিয়ে রাজার দরবারে আনত,তাকে পুরষ্কার দেওয়া হোত।

অর্থশাস্ত্রে (২.২.৫০) বলা হয়েছে যে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে সর্বোৎকৃষ্ট হস্তী পাওয়া যেত। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে কলিঙ্গ, অঙ্গ, করুশ প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ভারতে মধ্যম প্রকার হস্তী পাওয়া যেত। আর সৌরাষ্ট্র ও পাঞ্চজন্য রাজ্যের হস্তীগুলি ছিল নিকৃষ্টমানের। এই হস্তীগুলিকে উন্নততর করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত। হস্তীগুলির দেখাশুনার জন্যে যে সব অধ্যক্ষ হস্তীবনে নিযুক্ত থাকতেন তারা হস্তীদের সুরক্ষার জন্যে যত্নবান ছিলেন। নারী, পুরুষ, শিশু হস্তী নির্বিশেষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত। হস্তীধ্যক্ষ প্রশিক্ষণের পরে হস্তীশালা প্রদর্শনে আসতেন। ক্লান্ত হস্তীরা যাতে সঠিক পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারে তার প্রতি তার কঠোর দৃষ্টি থাকত। হস্তীদের প্রশিক্ষণের কঠোরতা বিচার করে তাদের আহার্য্য ধার্য করা হোত। এছাড়াও তাদের সেবা শুশ্রুষা সব কিছুর দায়িত্বই হস্তীধ্যক্ষের উপরে ছিল। গ্রীষ্মকালে হাতিদের ধরা হত। কুড়ি বছরের কম বয়সী হস্তীদের ধরা হোত না। যেসব হস্তীদের ধরা হোত না তারা হল – ছোটো হস্তী (বিক্কা), যেসব স্ত্রী হস্তীনীদের দন্তগুলি সমান দৈর্ঘ্যের ছিল (মুগ্ধা), যে সব হস্তীর দন্ত ছিল না, যে সব হস্তীনী তার শিশুদের স্তন্যপান করাতো (ধেনুকা)। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, একমাত্র দন্ত

বিশিষ্ট হলেই সেই সব হস্তীর শিকার করা হোত (অর্থশাস্ত্র ২.৩২.১৩৬)। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে (২.৩২.১৩৯) গজদন্তের গোড়া থেকে দন্তের পরিধির দ্বিগুন জায়গা ছেড়ে কাটা শুরু করতে হোত। নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হস্তীদের(নদীজ) আড়াই বছরে একবার দন্ত কাটা হোত। আর পার্বত্য অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হস্তীদের দন্ত পাঁচ বছরে একবার কাটা হোত।

যদি কোন ব্যক্তি হস্তীকে বিরক্ত করার ফলে হস্তী উন্মত্ত হয়ে ব্যক্তিটিকে আক্রমণ করত ও ব্যক্তটির মৃত্যু ঘটত, তবে তার পরিবারকে এক কুম্ভ সুরা, মালা , সুগন্ধী এবং হস্তীদন্তদ্বয় পরিষ্কার করার জন্যে প্রয়োজনীয় কাপড় দিতে হোত। সেই কাপড়ের দৈর্ঘ্য হস্তীদন্ত পরিষ্কারের প্রয়োজনানুযায়ী নেওয়া হোত। আবার যদি কোন হস্তীর আক্রমণে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হোত, তবে সেই মৃত্যুকে খুব সম্মানজনক বলে মনে করা হোত। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর পবিত্র স্নানকে যেমন পুন্য বলে মনে করা হত, ঠিক তেমনি হস্তীর দ্বারা আঘাতের ফলে মৃত ব্যক্তির পুণ্যলাভ হয়েছে বলে মনে করা হোত। অর্থশাস্ত্রে হস্তীবাবদ সুরাদানকে ‘পদধৌতকরণ’ (অর্থশাস্ত্র ৪.১৩ ২৩৪) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত বিবরণী থেকে হস্তী এবং হস্তীদন্তজাত দ্রব্যের সমাদর সম্পর্কে খুব সহজেই ধারনা করা যায়।

গ্রীক রাজা মিনান্দার ও বৌদ্ধ পন্ডিত নাগসেনের কথোপকথন ‘মিলিন্দিপন্হো’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অর্থশাস্ত্রের ন্যায় এই গ্রন্থটিতে দন্তকারদের কথা লিখিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে একটি হস্তীর সমগ্র জীবনকালে তার দন্ত বহুবার কাটা হোত। সুতরাং হস্তীদন্তজাত দ্রব্যের চাহিদা না থাকলে দন্তচ্ছেদন করা হতনা। ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ নগরীগুলিতে হস্তীদন্তশিল্প একটি অন্যতম জীবিকা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কপিলাবস্তু, তক্ষশীলা, রূপার, প্রভাসপতন , নাগড়া, শোনপুর প্রভৃতি নগরগুলিতে হস্তীদন্তজাত শিল্প বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সকল অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে হস্তীদন্তজাত সামগ্রী, যথা - মাথার কাঁটা, কাজল কাঠি, চিরুনী, অলঙ্কারের বাক্স, পাশা, তুরপুণ, পদক প্রভৃতি পাওয়া গেছে। ‘দন্তবাণিজ্য’ শব্দটি থেকে হস্তীদন্তজাত সামগ্রীর যে ব্যাপক বাণিজ্য চলত, সে কথা অনুমান করা যায়। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ছাড়াও হস্তীদন্তের বালা, বড় গহনা, আয়নার হাতল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কার পাওয়া যেত। জৈন সাহিত্যে হস্তীদন্তের মালার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জৈন সাহত্যগুলিও হস্তীদন্তজাত সামগ্রীর বানিজ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

‘পেরিপ্লাস অফ দ্য ইরিথ্রিয়ান সী’ হল প্রাচীন সমুদ্র বানিজ্যের বিবরণীমূলক একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি একজন অজানা নাবিকের লেখা এবং সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের রচনা। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে প্রাচীন বন্দর বারিগাজা (ব্রোচ) থেকে প্রচুর হস্তীদন্তজাত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হত। মালব, তার প্রভৃতি অঞ্চলের হস্তীদন্তজাতদ্রব্য বারিগাজা বন্দর মারফত রপ্তানি করা হতো । কৌটিল্য আরও উল্লেখ করেছেন যে কলিঙ্গ অঞ্চলের দোসরণে উৎকৃষ্ট হস্তীদন্ত পাওয়া যেত। এই হস্তীদন্তগুলি এতটাই উৎকৃষ্ট ছিল যে এদের একটি বিশেষ নামকরণ করা হয়েছিল। কলিঙ্গের হস্তীদন্ত ‘দোসরণ’, নামে পরিচিত ছিল[৩৪] পেরিপ্লাসে আরও বলা হয়েছে যে মুজিরিস মালাবার উপকূল থেকে হস্তীদন্তজাত দ্রব্য রোমে রপ্তানি করা হোত[৩৫]।

হস্তীদন্তের উৎকর্ষতা সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র ও পেরিপ্লাসে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য লক্ষ করা যায়। কৌটিল্যের মতে কলিঙ্গ, অঙ্গ, কারুস এবং পূর্বভারতীয় অঞ্চলগুলিতে শ্রেষ্ট হস্তীদন্ত পাওয়া যেত। কিন্তু পেরিপ্লাসের লেখকের মতে ‘দোসরণ’ হস্তীদন্ত ছিল মধ্যম জাতীয় । তবে হস্তীদন্ত শিল্প যে বহুল পরিমানে বিকশিত হয়েছিল যে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হস্তীদন্ত সামগ্রীর বানিজ্য অত্যন্ত লাভজনক ছিল। গুট্টিল জাতকে (২.২৪৩) বলা হয়েছে যে বারানসী থেকে শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে দন্ত ব্যবসায়ীরা উজ্জয়িনী যেতেন। উজ্জয়িনী সেকালে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল।

হস্তীদন্তজাত সামগ্রী প্রস্তুতকারী শিল্পী ও বণিকরা যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি করেছিলেন। সাহিত্যিক বিবরণী ছাড়াও সাঁচিস্তুপের দক্ষিণ দিকের তোরণ দ্বার এই ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বিদিশার হস্তীদন্ত শিল্পীরা এই তোরণটি নির্মাণ করেছিলেন। তোরণ দ্বারে 'রূপ-কম্মম-কাটম' শব্দটি দেখতে পাওয়া যায়। এই শব্দটি হস্তীদন্তকারদের বোঝাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে হস্তীদন্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের নিজস্ব বণিক সঙ্ঘ ছিল। তারা স্বেচ্ছায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাদের অনুরক্ততা জ্ঞাপন করার জন্যে ওই দ্বারটি নির্মাণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক মোতিচন্দ্র বলেছেন যে

> "পাথরের মত নতুন মাধ্যমে তারা কাজ করেছিলেন, তাই তাদের উৎকর্ষতা নিয়ে বিচার করা যায় না। কিন্তু যেভাবে তারা বিষদভাবে পাথরের ওপর সূক্ষকাজ করেছিলেন, তা দক্ষ কারিগর ছাড়া করা সম্ভবপর ছিল না।"

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের মধ্যে হস্তীদন্ত শিল্প প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। হস্তীদন্তের দ্বারা দুভাবে সামগ্রী প্রস্তুত করা হোত। হস্তীদন্তের ছোটো ছোট টুকরো কেটে তার মধ্যে কারুকার্য করে শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত করা হোত। কখনো আবার সমগ্র দন্তটিকে খোদাই করেও শিল্প সামগ্রী তৈরী হোত। তক্ষশিলা, প্রভাসপতন, উজ্জয়িনী, রাজঘাট, বিদিশা, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের পরবর্তীকালে ব্যাপক হারে হস্তীদন্তজাত বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে এইভাবে হস্তী ও হস্তীদন্তজাত দ্রব্যের চাহিদা শুধু ভারতবর্ষে নয়, বহির্ভারতেও বিস্তারলাভ করেছিল। বিলাস দ্রব্য ছাড়াও, নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা দ্রব্যাদি, যা সাধারন মানুষ ব্যবহার করত , সেগুলি হস্তীদন্ত দ্বারা তৈরী হোত। ফলে ভারতের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাচীন ভারতের এই শিল্পটি একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রেখে গেছে। শিল্পীদের কারিগরী কুশলতা এই শিল্পকে একটি ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করতে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছে।

তথ্যসূত্র

1. W. H. Schoff, trans., The Periplus of the Erythrean Sea, New York: Longmans Green, 1912, p. 193.
2. E.B. Cowell , ed., The Jātaka, London: Cambridge University Press, 1895-1907, vol. I, p. 174.
3. A.K .Bhattacharyya, A Cyclopedia of Indian Ivory Art, Kolkata, Punthi Pustak, 2012, p. 3.
4. A.F. Rudolf Hoernle, ed., (trans), The Uvāsagadasāo-The Seventh Anga of the Jains, Calcutta: Asiatic Society, First Published-1885-90, p. 74.
5. Patrick, Olivelle, ed., (trans.), Dharmasūtras, The Law codes of Âpastamba, Gautama, Baudhāyana and Vasiṣṭha, New Delhi: Motilal Banarasidass Publishers (Pvt. Ltd.), 01, January 2000, p. 213.
6. Patrick Olivelle, ed., (trans.), Manu's Code of Law, A critical edition and translation of Mānava- Dharmāsāstra, with editorial assistance of Olivelle, Suman, New York: Oxford University Press, 2005, p. 286.
7. E.B. Cowell, ed., The Jātaka, London: Cambridge University Press, 1895-1907, vol. V, p. 20.
8. Moti Chandra, "Ancient Indian Ivories" in Bulletin of the Prince of Wales Museum, Bombay, 1957-59, volume-6, p.8.

9. Vinod P. Diwedi, Indian Ivories: A survey of Indian ivory and bone carvings from the earliest to the modern times, New Delhi, Agam Prakashan, p.12.
10. E.W. Burlingame, ed. & trans., Buddhist Legends: Dhammapada Commentary, Cambridge: Harvard University Press, First edition, 1921, Part-I, volume. I, p. 191.
11. Nalinaksha Dutt, with assistance of Pandit Shivnath Shastri, ed., Gilgit Manuscripts, Research Department, Srinagar, Kashmir, The Kashmir Series of texts and studies, No: LXXI, 1947, Volume – III, Part- I, p. 171
12. I. B. Horner, trans., The Book of Discipline (Vinaya- Pitaka), Suttavibhaṅga, London: Luzac & Company Ltd., Reprint: 1957, volume- III, p. 87.
13. I. B. Horner, trans., The Book of Discipline (Vinaya- Pitaka), Cullavagga, London: Luzac & Company Ltd., 1952, Volume-V, p. 216.
14. T.W. Rhys Davids, Hermann Oldenberg, trans, MaxMüller, F, ed., Vinaya Texts Sacred Books of the East, (Henceforth SBE), The MahavaggaV-X, The kullavagga I-III, Oxford: Clarendon Press, 1882, Part-II., volume- XVII, p.51-214.
14. T.W. Rhys Davids, Hermann Oldenberg, trans., MaxMüller, F, ed., Vinaya Texts, Sacred Books of the East, New Delhi: Motilal Banarasidass Publishers (Pvt. Ltd.), 1885, Part-III., volume-XX, p. 91-95.
15. J.J. Jones, trans., Mahāvastu, London: Luzac & Company Ltd., 1952, volume, II, p. 421.
16. R. Shamasastry, trans., Kauṭilya's Arthaśāstra, Mysore: Sri Raghuveer Printing Press, Fourth Edition, 1951, p. 49 -262.
17. I. B. Horner, trans., Milinda's Questions, Pali Text Society, 1, December, 1964, volume-I, p. 292.
18. M.K. Pal, Crafts and Craftsmen in Traditional India, New Delhi, Kanak Publications, 1978, p.45-46.
19. D.C. Jain, Economic Life in Ancient India as Depicted in Jain Canonical Literature, On behalf of Research Institute of Prakrit, Jainology & Ahimsā, Vaiśāli (Bihar), 1980, p.57.
20. J. C. Jain, Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canon and Commentaries, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers (Pvt. Ltd.), Second Revised Edition, 1984, p.132.
21. A.F. Rudolf Hoernle, ed., trans., The Uvāsagadasāo-The Seventh Anga of the Jains, Calcutta: Asiatic Society, First Published-1885-90, p.29.
22. W. H. Schoff, trans., The Periplus of the Erythrean Sea, New York: Longmans Green, 1912, p. 15-50.
23. E.B. Cowell, ed., The Jātaka, London: Cambridge University Press, 1895-1907, vol. II, p. 172.
24. Jas Burgess, ed., Epigraphia Indica, Calcutta: Printed and published by the Superintendent of Government Printing India, volume-II, No. 200, p.378.
25. Stella Kramrisch, "Early Indian Ivory Carving", in Philadelphia Museum of Art Bulletin, Philadelphia Museum of Art, spring, 1959, volume – 54, p.55-56.